গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২২ সংখ্যা | ১০ - ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

২১ জানুয়ারি লেনিন স্মরণদিবসে মহামিছিল

মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র সব অংশের মানুষের ব্যাপক সাড়া

আর জি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর নৃশংস খুন-ধর্ষণের ঘটনায় জনমনে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তা কি নিভে এল? কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে, এটা ছিল মধ্যবিত্তের আন্দোলন। কিন্তু বাস্তবে আন্দোলনটা কি শুধু মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? তা কি বৃহৎ অংশের মানুষকে স্পর্শ করতে পারেনি? এমন সব প্রশ্নের উত্তর মিলল ২১ জানুয়ারি মহামিছিলের প্রচার করতে গিয়ে।

উত্তর কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত এলাকায় প্রচার চলছিল। প্রচারপত্রে প্রথমে রয়েছে অভয়া কাণ্ড সহ স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও থ্রেট কালচারে জড়িত অপরাধীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি। লিফলেটটি হাতে নিয়েই এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, কী ভেবেছে সরকার আর সিবিআই? ভেবেছে এই ভাবে খুনিদের আড়াল করবে? পারবে না। আপনারা মিছিলের ডাক দিয়ে একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ করেছেন।

প্রচার টিম পাশের বসতিতে গিয়ে ঢুকতে প্রায় প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ বললেন, আমি তো অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে রাত জেগেছি। কেউ বললেন, আমার পরিবার সহ গোটা পাড়া গিয়েছি মিছিলে। বাস্তবিকই মধ্যবিত্তের সাথে নিম্নবিত্ত, দরিদ্র মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া আর জি কর আন্দোলন এত বৃহৎ, এত দীর্ঘস্থায়ী এবং দেশ-বিদেশে এত প্রভাব ফেলতে পারত না। এই ব্যাপক

দুয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বহাল রাখার দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র

এসএসসি-২০১৬ প্যানেলে মেধার ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

তৃণমূল সরকারের চূড়ান্ত দুর্নীতির জন্যই চাকরি নিয়ে এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির ভূমিকাও অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তারাও নানাভাবে শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের যে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে আন্দোলনকারীদের সাহায্য করার দরকার ছিল, তা তারা করছে না।

এই প্যানেলে যাঁরা স্বচ্ছতার সাথে যোগ্যতা প্রমাণ করে উত্তীর্ণ হয়েছেন ও নিয়োগ পেয়েছেন তাঁদের চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়া কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না। দুর্নীতির সাথে যুক্ত থেকে যাঁরা অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন এবং যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করেছেন তাঁদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত অযোগ্য প্রার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের পরিবর্তে যোগ্য প্রার্থীদের অবিলম্বে নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে দাবি করছি।

সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বলি সিরিয়া - পৃঃ ৫

পিছনের দরজা দিয়ে আবার তিন কালা কৃষি আইন চালুর চেষ্টা

নিউ ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং

প্রবল ঠাণ্ডা ও গ্রীষ্মের দাবদাহকে অগ্রাহ্য করে দিল্লিতে লক্ষ লক্ষ কৃষক তেরো মাসব্যাপী ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিলেন। এই সংগ্রামে ৭৫০ জন কৃষক আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তাঁরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন, বিজেপি সরকার প্রবর্তিত তিন কালা কৃষি আইন তাঁদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে— তাই যে কোনও মূল্যে তা প্রতিরোধ করতেই হবে। তাঁদের অদম্য তেজ ও সংগ্রামে বিজেপি সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল। তিন কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের চাপে আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেও বিজেপি সরকার তাদের পরিকল্পনা ত্যাগ করেনি। তারা নানা কায়দায় তাদের কর্পোরেট প্রভুদের সেবা কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। এখন তারা আবার নতুন বোতলে পুরোনো মদিরা পরিবেশন করছে। 'ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচার মার্কেটিং'— এই শিরোনামের আড়ালে কৃষকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত সেই তিন কালা কৃষি আইন ফিরিয়ে আনার হীন চেষ্টা চালাচ্ছে।

জাতীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় গত ২৫ নভেম্বর কৃষি বিপণন সম্পর্কে নতুন জাতীয় নীতির খসড়া প্রকাশ করেছে। এই নীতির উদ্দেশ্য কী? খসড়ায় বলা হয়েছে, দেশের মধ্যে এমন একটা সতেজ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যেখানে সমস্ত কৃষক তার কৃষিপণ্য সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করার জন্য পছন্দমতো বাজার পাবে (অনুচ্ছেদ-২)। এই বিপণন ব্যবস্থা কী ভাবে পরিচালিত হবে? বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি— এই দুইয়ের অংশগ্রহণে যৌথভাবে এটি পরিচালিত হবে। তাই কৃষি বিপণন আইন ও নীতির সংস্কার এই উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হবে। (অনুচ্ছেদ ৩.২)

কৃষিতে বহুজাতিক পুঁজির অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা

দেখা যাক, এই উদ্দেশ্যে তারা কৃষি বিপণন আইন ও নীতির কী ধরনের সংস্কার করতে চাইছে? এবং এর দ্বারা তারা কী ধরনের ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে?

খসড়ায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ব্যক্তি মালিককে পাইকারি বাজার খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। (অনুচ্ছেদ-৭.১.,৩.১) খাদ্য

তিনের পাতায় দেখুন

প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেলের দাবি শিক্ষকদের

২৯-৩১ ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম শহরের আকাশ ভবনে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তিন দিন ব্যাপী ২৯তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি সেমিনারে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশফেল চালু সহ শিক্ষানীতি পরিবর্তনের দাবি করা হয়। সম্মেলন উপলক্ষে শিক্ষকদের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে এবং পাঁচ মাথার মোড়ে প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ দলুই, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক ফটিকচাঁদ ঘোষ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য দিলীপ মাইতি, অভ্যর্থনা কমিটির সহ সভাপতি সুভাষ সিংহ, সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা, অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সমীর বেরা। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মোসাব্বর হোসেন। সম্মেলনে 'জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতি সরকার পোষিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করছে' শীর্ষক সেমিনারে আলোচনা করেন নাড়াজোল রাজ কলেজের অধ্যাপক মঙ্গল কুমার নায়ক, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা মাইতি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলনে শিক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট মানুষ দিলীপ মাইতিকে সভাপতি

পাঁচের পাতায় দেখুন

বজবজে বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা স্মরণে সভা

বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা এবং এস ইউ সি আই (সি) -র বজবজ লোকাল কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড তিমিরবরণ ঘোষ স্মরণে এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে ৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বজবজের চড়িয়ালে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষ। প্রধান বক্তা ছিলেন চটকল আন্দোলনের নেতা, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সহ-সভাপতি এবং বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড অমল সেন। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এবং ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার এ আই ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদক কমরেড বিজন হাজরা।

মানুষের ব্যাপক সাড়া

একের পাতার পর

অংশের মানুষের অংশগ্রহণ এক দিকে যেমন অভয়ার উপর নৃশংসতার বিচার চেয়ে, তেমনই সাধারণ মানুষের, দরিদ্র মানুষের, শোষিত, প্রবঞ্চিত মানুষের প্রতিদিনের ক্ষোভ, বঞ্চনার যন্ত্রণাও মিশে রয়েছে এই বিচার চাওয়ার মধ্যে। অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবির মধ্যে সাধারণ মানুষ তাঁদের উপর প্রতিদিন ঘটে চলা অসংখ্য অন্যায়-অবিচারের ন্যায়বিচারের আশা খুঁজে পেয়েছেন। তাই তাঁরা আন্দোলনের সঙ্গে এতখানি একাত্ম হতে পেরেছেন।

বাস্তবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, সীমাহীন দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মদ ও মাদকের প্রসার, নারীত্বের অবমাননা প্রভৃতি নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-যন্ত্রণার ছোট ছোট ঢেউগুলো মিশে গিয়েই আন্দোলনের এই জোয়ার তৈরি করেছে। আজ যখন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আর জি কর আন্দোলনের দাবির সঙ্গে জীবনের অন্য দাবিগুলিকে মিলিয়ে মহামিছিলের ডাক দিয়েছে তখন মানুষ এই মিছিলকে তাঁদের নিজেদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন বলেই মনে করেছে। মিছিল সফল করতে তাই তাঁরাও উদ্যোগ নিচ্ছেন। একজন বললেন, আমি অতি সাধারণ মানুষ। আপনাদের মতো করে আন্দোলনের কথাগুলো হয়ত বলতে পারব না, কিন্তু পাড়ার কিছু মানুষকে আমি জুটিয়ে দেব, আপনারা আসুন, তাদের মধ্যে এই কথাগুলো বলবেন।

বিজেপি সহ তথাকথিত বিরোধী দলগুলি আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে তাকে নির্বাচনী রাজনীতির স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলেও অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের এই আবেগই সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই ব্যর্থতা থেকেই জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে এরা প্রচার করে চলেছে যে, আন্দোলন করে কী লাভ হল, দাবি তো আদায় হল না। এই প্রচার তাদের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্রকেই তুলে ধরেছে। সবাই জানেন, আন্দোলনের চাপে চরম উদ্ধত তৃণমূল সরকার যেমন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়েছে, তেমনই আন্দোলনের চাপেই মেডিকেল কলেজগুলিতে থ্রেট-কালচারের বিরুদ্ধে, দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও আন্দোলন জারি রেখেই সেই সব প্রতিশ্রুতি পালনে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। শাসক দলগুলি তাদের কার্যকলাপের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে যে হতাশার জন্ম দিয়েছে এই আন্দোলন সেই হতাশাকে অনেকখানি ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করেছে। জনমনে জন্ম দিয়ে গেছে অদ্ভুত এক প্রতিবাদী সত্তার।

সরকারের চোখে চোখ রেখে কথা বলার, দাবির কথা ঘোষণা করার যে স্পর্ধা মানুষ দেখিয়েছে তা কি এই আন্দোলনের কম অর্জন! জীবন-যন্ত্রণার বিরুদ্ধে যাঁদের প্রতিদিন লড়াই করতে হয়, কর্মস্থলে যাঁদের প্রতিদিন অজস্র প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, অপমান সহ্য করতে হয়, তাদের এই অর্জন বুঝতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই অর্জনকে তারাই অস্বীকার করতে চায় যারা এই স্থিতাবস্থার সুবিধা ভোগ করছে, যারা এই স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করতে চায়, শোষণ-বঞ্চনাকে স্থায়ী করতে চায়। অন্য দিকে যাঁরা এর অবসান চান তাঁরা বুঝবেন, প্রতিপক্ষ এখানে কতখানি শক্তিশালী এবং আন্দোলন সেই অচলায়তনকে কতখানি ধাক্কা দিয়েছে। একদিকে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার, পুলিশ-সিবিআই, বিচার ব্যবস্থা, সুবিধাভোগী নানা কায়েমি শক্তি, তার সাথে আগের সরকারের আমলের ঔদ্ধত্য ও অপশাসনের ধারাবাহিকতা, আর তার বিপরীতে কোটি কোটি শোষিত নির্যাতিত বঞ্চিত সাধারণ মানুষ, যাদের সম্বল সততা, নিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার আদায়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সম্পূর্ণ দাবি আদায়ের জন্য তাই দরকার আন্দোলনকে আরও সচেতন, সংঘবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী করা। এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই মানুষের মধ্যে যে চেতনা, যে স্পর্ধার জন্ম দিয়েছে তা-ই আন্দোলনকে আরও বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে, সমস্ত বিভ্রান্তি, হতাশা থেকে রক্ষা করবে। ছিনিয়ে নেবে ন্যায়বিচারের দাবি, যা আসলে মানুষের বাঁচার দাবি।

পাশাপাশি লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি মানুষের জীবনকে জেরবার করে দিচ্ছে। অথচ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও চেষ্টা রাজ্য কিংবা কেন্দ্র কোনও সরকারের নেই। ফাটকাবাজি, কালোবাজারি অবাধে চলছে। সর্বত্রই মানুষ এ-সবের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধি রোধ মিছিলের অন্যতম দাবি হিসাবে থাকায় মানুষ মিছিলকে দু-হাত তুলে সমর্থন করছেন। একই ভাবে মিছিলের দাবি হিসাবে উঠে এসেছে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার বিষয়টি— যা রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার কৃষিপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। কেন্দ্রের শাসক বিজেপি নতুন করে যে কৃষি-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন আনছে তা কৃষকদের সর্বনাশকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি তারা নিয়ে এসেছে, তা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বেসরকারি মালিকদের ব্যবসার পণ্যে পরিণত করবে, অন্য দিকে শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তাতে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আমদানি ঘটাবে। নতুন শ্রমনীতি যেমন শ্রমিকদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে কেড়ে নেবে, আট ঘণ্টা কাজের রীতি বাতিল করে মালিকদের হাতে যতক্ষণ খুশি খাটানোর অধিকার তুলে দেবে, তেমনই নতুন বিদ্যুৎনীতিও সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি বোঝা চাপাবে আর বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের অবাধ লুঠের ব্যবস্থা করে দেবে। চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা আগের সরকারের মতোই বর্তমান সরকারের আমলেও একই রকম ভাবে বেড়ে চলেছে। মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ-খুন বেড়েই চলেছে। বেকারত্ব আকাশ ছুঁয়েছে। সব সরকারের সব প্রতিশ্রুতি বেকারদের প্রতি চরম প্রতারণা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আজ আন্দোলন ছাড়া জনগণের হাতে আর কোনও বিকল্প নেই। অথচ রাজ্যের তথাকথিত বিরোধী দলগুলি জনজীবনের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের পরিবর্তে, কী ভাবে মানুষের ক্ষোভকে ভোটের কাজে লাগানো যায় সেই চিন্তাতেই মশগুল। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর লাগাতার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এই মহামিছিলের ডাক জনমনে প্রবল আলোড়ন তুলছে।

জীবনাবসান

কলকাতায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বরানগর আঞ্চলিক কমিটির সংগঠক ও দলের সদস্য কমরেড মঞ্জু চক্রবর্তী দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৮ ডিসেম্বর সকালে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ৭০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯ ডিসেম্বর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৯৭৭-৭৮ সালে দলের কলকাতা জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য ও বরানগর আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড সাধন চক্রবর্তীর সাথে বিবাহসূত্রে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর আদর্শের সাথে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়ে দলের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

কমরেড মঞ্জু চক্রবর্তী বরানগর পৌরসভায় স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে কাজ করতেন। তিনি কর্মচারী ইউনিয়নের মধ্যে দলের চিন্তা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। পৌরসভা পরিচালনায় নানা জনস্বার্থ ও কর্মী-স্বার্থবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সরব হতেন তিনি। এর জন্য তাঁকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি বরানগরে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে কাজের সূত্রে তিনি এলাকার গরিব মানুষের মধ্যে যেতেন। সেই পরিবারগুলির মহিলারা পরিচারিকার কাজ করতেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে মিশতেন। নিজেও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। এর ফলে তিনি ওই এলাকার মানুষের খুব কাছের একজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই ভূমিকা দেখে দল তাঁকে পরিচারিকাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়। ধীরে ধীরে তিনি ওই অঞ্চলে পরিচারিকা সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁদের বহুজনকে দলের সমর্থক ও দরদি হিসাবে গড়ে তোলেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি সেই এলাকার মানুষদের খবরাখবর রাখতেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতে আঞ্চলিক স্তরে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। এলাকায় টেনামেন্টবাসীদের বাসস্থানরক্ষার আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন। মদের ব্যবসা বন্ধের বিরুদ্ধে দলের উদ্যোগে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে যে আন্দোলন, তাতেও তিনি পরিচারিকা ও এলাকার মহিলাদের যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল কর্মীদের কাছে অবারিত। মাতৃস্নেহে তিনি কর্মীদের যত্ন নিতেন। কমরেড মঞ্জু চক্রবর্তীর প্রয়াণে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

২৯ ডিসেম্বর বরানগর আঞ্চলিক কমিটির অফিসে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কাজল ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রমা মুখার্জী। এ ছাড়া আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্যও বক্তব্য রাখেন। দলের কলকাতা জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সাধন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড মঞ্জু চক্রবর্তী লাল সেলাম

কালা-কৃষি আইন চালুর চেষ্টা

একের পাতার পর

প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা, রপ্তানিকারী সংস্থা, সংগঠিত খুচরো বিক্রেতা সংস্থা, যারা একসাথে অনেক কৃষিপণ্য ক্রয় করে, তাঁদের মাঠ বা জমি থেকে সরাসরি কৃষিপণ্য ক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হবে (অনুচ্ছেদ-৭.১,৩.৪)। কৃষি বিপণনে ব্যক্তিগত 'ই-ট্রেডিং' (অনলাইন-ব্যবসা) সংস্থা স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হবে। অর্থাৎ, সর্বত্রই বহুজাতিক পুঁজিকে প্রবেশের অবাধ সুযোগ করে দেওয়া হবে। তা হলে আগের কৃষিনীতির সঙ্গে এর কোথায় পার্থক্য? আগের নীতির সঙ্গে আরও কিছু সংস্কার পরিকল্পনা যোগ করা হয়েছে যা এই বিপণন ব্যবস্থায় দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে সাহায্য করবে।

এমএসপি আইনসিদ্ধ করার সম্বন্ধে একটি শব্দও নেই

অত্যন্ত পরিহাসের বিষয়, নূতন কৃষি বিপণন নীতি সংক্রান্ত এই পরিকল্পনায় এমএসপি-কে আইনসিদ্ধ করা সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয়নি। অথচ এটাই দেশে কৃষকদের সর্বপ্রধান দাবি। ফড়েদের, মধ্যসত্বভোগী বা মিডলম্যানদের, বহুজাতিক পুঁজির শোষণ থেকে রেহাই পেতে গেলে এই আইনটা অত্যন্ত জরুরি। পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস বিজেপি সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা পুরোপুরি অস্বীকার করছে।

এই নীতিতে চুক্তি চাষ চালুর লক্ষ্যে বলা হয়েছে ঃ চুক্তি চাষ, বাজার ও বাজারে দামের ঝুঁকি সংক্রান্ত বিষয়ে তদারক করার একটা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে (অনুচ্ছেদ ১০.১.১)। আরও বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আদলে বিমা প্রকল্প পরিচালিত হবে (অনুচ্ছেদ ১০.১.৩)।

গ্রামীণ হাটগুলি চলে যাবে বহুজাতিক পুঁজির দখলে

বর্তমানে আমাদের দেশে এপিএমসি (এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেট কমিটি) আইনের অধীনে ৭০৫৭টি সংগঠিত পাইকারি বাজার আছে। এ ছাড়া ৫০০ অনিয়ন্ত্রিত এবং ২২৯৩১টি গ্রামীণ হাট আছে। গ্রামীণ হাটগুলি মূলত গ্রামীণ পুঁজিপতিরা নিয়ন্ত্রণ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই আমাদের দেশের কৃষকরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা বাজারের অভাব। অর্থাৎ একটা প্রকৃত বিপণন ব্যবস্থা যেখানে কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফসল লাভজনক দামে বিক্রি করতে পারবে। সেই ব্যবস্থা না থাকার ফলে কৃষকরা উৎপাদন খরচের চেয়েও অনেক কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই ভাবেই তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার বেদনাদায়ক পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

কৃষিপণ্য বিক্রি করার এই প্রক্রিয়ায় প্রায়শই ঋণদাতারা কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এই কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় দালালদের নানা ধাপের ব্যবস্থা এত বিশাল যে, কৃষকরা তাদের কৃষিপণ্যের বিক্রয়মূল্যের খুব কম অংশই পায়। দেখা গেছে, চালের ক্ষেত্রে কৃষক বিক্রয়মূল্যের মাত্র ৫৩ শতাংশ পায়, এই প্রক্রিয়ায় দালালরা পায় ৩১ শতাংশ আর অবশিষ্ট ১৬ শতাংশ যায় বিপণন খরচ হিসাবে। সবজি ও ফলের ক্ষেত্রে কৃষকের অংশ আরও কম। সবজিতে কৃষক পায় বিক্রয় মূল্যের ৩৯ শতাংশ এবং ফলের ক্ষেত্রে ৩৪ শতাংশ। এখানে বিপণন প্রক্রিয়ার দালালরা পায় যথাক্রমে ২৯.৫ শতাংশ এবং ৪৬.৫ শতাংশ। এই বিপণন প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী ফড়িয়ারা হল গ্রাম্য ব্যবসায়ী, দালাল, পাইকারি ব্যবসায়ী, খুচরো ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

এপিএমসি আইন অনুযায়ী, কৃষকরা এপিএমসি ইয়ার্ডে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করত লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের কাছে। এই এপিএমসি বা কৃষিপণ্য মার্কেটিং কমিটি কৃষকদের দ্বারা নির্বাচিত একটি সংস্থা। এর মানে এই সংস্থা যে কৃষকদের স্বার্থ যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষা করত, তা নয়। তবুও লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের ওপর এই সংস্থার একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাই নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বে ও কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা খানিকটা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারত।

কিন্তু ১৯৯১-এ বিশ্বায়ন-উদারিকরণের নীতি অনুযায়ী তৎকালীন কংগ্রেস সরকার মনমোহন সিংহের পরিকল্পনার হাত ধরে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন যুক্তি করা হয়েছিল, এই ব্যবস্থা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং তারা মুক্ত ও সংগঠিত খুচরো বাজারে সরাসরি তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবে। এর ফলে তারা কৃষি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় স্বচ্ছন্দে কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারবে এবং বিপণন ব্যবস্থার তথ্য বিনিময় ও গ্রহণের সুযোগ নিয়ে তারা লাভবান হবে। কিন্তু বাস্তবে হয়েছিল ঠিক উল্টো। কংগ্রেস সরকার এপিএমসি আইন পাল্টে ব্যক্তি পুঁজির হাতে কৃষিপণ্য সংগ্রহের আইনি অধিকার দিয়ে দেয় এবং চুক্তি চাষকে আইনসিদ্ধ করে। এইভাবে কৃষিতে একচেটিয়া পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ আরও প্রশস্ত হয়।

বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসের দেখানো সেই পথই অনুসরণ করে আরও জোরকদমে তা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে কৃষকদের দুর্দশা আরও বাড়ছে। তারা এখন সমস্ত কৃষিপণ্য— চাল, গম, ডাল, সব্জি, তৈলবীজ, দুধ, মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা করে 'ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং' শিরোনামে নিয়ে এসেছে। এই লক্ষ্যেই আধুনিকীকরণের নাম করে তারা এপিএমসি-র মাধ্যমে যে কৃষিবিপণন ব্যবস্থা বর্তমানে আছে তার সমস্তটাই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হাতে তুলে দিতে চাইছে। গ্রাম ভারতে যে ২৯ হাজারের বেশি হাট আছে তার পরিচালন-ব্যবস্থার উপর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এর ফলে গ্রামস্তর পর্যন্ত কৃষিপণ্য ও তার বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক ও সর্বাত্মক বেসরকারিকরণ এবং বৃহৎ পুঁজির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে।

কৃষকরা কি কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ চেয়েছিল? না। কারণ তারা জানে এই বেসরকারিকরণ তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেবে। কৃষি উপকরণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের অভিজ্ঞতা হল, এর ফলে ভয়ানক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, যার বোঝা চাষির পক্ষে বহন করা অসম্ভব।

বিজেপি সরকারের কৃষি বিপণন নীতির মারাত্মক কিছু বৈশিষ্ট্য

কৃষকদের উৎপন্ন করা কাঁচামাল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ব্যবসায়ী সংস্থা এবং রপ্তানিকারক সংস্থা নিয়ন্ত্রিত বাজারে আসে। কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণকারী এই শক্তিগুলোই বাস্তবে বাজারে কৃষিপণ্যের দাম কী হবে তা নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। কোনও সরকার কৃষককে তার উৎপন্ন ফসলের লাভজনক দাম দিতে চাইলে সেই সরকারকে অবশ্যই এই শক্তিগুলোর উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং কৃষককে লাভজনক দাম দেওয়ার জন্য তাদের বাধ্য করতে হবে। কিন্তু এই কাজ করা তো অনেক দূরের কথা, সরকার কৃষি বিপণন নীতির পরিকল্পনায় এমন সব বিধান দিয়েছে যাতে কৃষককে ঠকানোর এই শক্তিগুলো আরও বলবান হবে।

দ্বিতীয়ত, এই দলিলে এমন সব প্রস্তাব রাখা হয়েছে যাতে কৃষিপণ্যের সমগ্র বিপণন ব্যবস্থাটি অর্থাৎ কৃষকের জমি থেকে একেবারে কোম্পানির গুদামঘর পর্যন্ত এমনকি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পর্যন্ত সবটাই সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আদলে পরিচালিত হবে। এতে সমগ্র খাদ্যসামগ্রী মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। তারা ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে মুনাফা করবে। কৃষক সহ সাধারণ মানুষ অনেক বর্ধিত দামে তাদের থেকে তা কিনতে বাধ্য হবে এবং আর্থিক সংকটে পড়বে।

তৃতীয়ত, এই নীতিতে এমন প্রস্তাবও আছে যাতে বেসরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষিপণ্যের ব্যবসার ক্ষেত্রে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রণমুক্ত ভাবে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যাতে কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলো (এফপিও) বিপণন ব্যবস্থায় ফড়িয়া ও ব্যবসায়ীদের ছাড়াই বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কারখানায়, ব্যবসায় এবং রপ্তানির জন্য প্রত্যোশিত এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নির্বিঘ্নে সরাসরি যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে।

চতুর্থত, কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য (ফরোয়ার্ড ট্রেডিং) এবং শেয়ার বাজারের প্রবেশদ্বার যাতে সহজে খুলে যায় এই সংস্কার প্রস্তাবে সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দেশীয় কৃষি ও খাদ্য প্রস্তুতকারক কারখানাগুলোর উপর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার রাস্তা আরও প্রশস্ত হবে। এর ফল মারাত্মক। কৃষকরা আরও বেশি করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে, সব কিছু হারিয়ে তারা পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হবে, বেকারত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকের আত্মহত্যা আরও বাড়বে। কৃষক ও খেতমজুরের সাথে সাধারণ জনগণের দুঃখ দুর্দশা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

পঞ্চমত, এই সংস্কারে প্রস্তাব করা হয়েছে, 'চুক্তিচাষ বাজার ও দামের ঝুঁকি নিরসনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। (অনুচ্ছেদ-১০.১.১)

এটি একটি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব। মূল প্রশ্ন, কার সাথে কার চুক্তি? এই চুক্তির একদিকে আছে প্রচুর আর্থিক ক্ষমতায় বলীয়ান বিশাল বিশাল বহুজাতিক কোম্পানি, যাদের সরকারি প্রক্রিয়ার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। অন্য দিকে আছে আর্থিকভাবে দুর্বল গরিব ও প্রান্তিক কৃষক। দৈত্যাকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলো হল ক্রেতা আর ক্ষুদ্র চাষি হল উৎপাদক ও বিক্রেতা। এ ক্ষেত্রে চুক্তি বাস্তবে বহুজাতিক কোম্পানির পক্ষেই যায়, এটাই কৃষকদের অভিজ্ঞতা। বাস্তবে কৃষকরা বহুজাতিক কোম্পানিগুলির চুক্তির ফাঁদে একবার আবদ্ধ হয়ে গেলে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন।

ষষ্ঠত, এই সংস্কার প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আদলে একটি বিমা প্রকল্প চালু করা হবে। বিচার করে দেখতে হবে, এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যে ফসল বিমা যোজনা চালু করা হয়েছে তাতে এ পর্যন্ত কার লাভ হয়েছে? কৃষকের নয়, এতে লাভ হয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর। বিমায় বাস্তবে কৃষকের দুঃখ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানি ব্যবসা করে। সমস্ত তথ্য ও প্রতিবেদন

সাতের পাতায় দেখুন

ব্যাপক আন্দোলনের ডাক এ আই কে কে এম এস-এর

এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ৪ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সিস্টেমের খসড়া, যা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রক সম্প্রতি প্রকাশ করেছে, কার্যত ২০২১-এর তিন কৃষি আইনের থেকেও বেশি ক্ষতিকারক। যদি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় তা হলে কৃষক, খেতমজদুর, কুটিরশিল্পী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বিপন্ন হবে। এই প্রকল্প বর্তমান কৃষিবাজার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত একটি জাতীয় বাজার ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে চায়, যেটি একটি মুনাফাকেন্দ্রিক পরিকাঠামোর অংশ হয়ে থাকবে।

এই নীতির উদ্দেশ্য কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে কর্পোরেটের ঢোকার পথ করে দেওয়া এবং সারা দেশের ৭০৫৭টি রেজিস্টার্ড মার্কেট ও ২৯৯৩১টি গ্রামীণ হাটকে ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে তা কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া। খসড়াতে এই প্রকল্প কেবল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরি। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এই খসড়ায় কোথাও মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস (এমএসপি) যা কিনা ভারতীয় কৃষকদের দীর্ঘকালের দাবি, তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আমরা ভারতের সকল কৃষক এবং সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি, যার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের এই কৃষকবিরোধী, জনবিরোধী, পুঁজিপতিদের স্বার্থে তৈরি প্রকল্পকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে।

দিল্লির শালিমার বাগে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে সমাজসংস্কারক ও নারীশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দুই যোদ্ধা সাবিত্রীবাই ফুলে এবং ফতিমা শেখের জন্মদিবস উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি তাঁদের স্মরণে একটি সভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের দিল্লি সভানেত্রী সীতা সিংহ। সভা পরিচালনা করেন নীতু খান্না।

‘তোমাদের প্রচার দেখে মন ভরে গেল’

✦ ‘তোমাদের দলের কর্মীরা পার্ক স্ট্রিট মোড়ে মহামিছিলের প্রচার করছেন। আমাকেও একটা লিফলেট দিয়েছেন। দেখলাম, মিছিলের দাবিগুলির প্রথমটিই আর জি করের অভয়া কাণ্ড এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও থ্রেট কালচারে জড়িত সব অপরাধীদের শাস্তির দাবি। তাঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে, সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে প্রত্যেককে ধরে ধরে যে ভাবে প্রচার করছেন দেখে মন ভরে গেল। সত্যি বিচার এনে দিতে হয়তো যা করণীয় সেটা এঁরাই করছেন।’ আর জি করের জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের এক নেতাকে কথাগুলো বললেন সেখানকারই একজন রেসিডেন্ট ডাক্তার, যিনি অভয়ার ন্যায়বিচার আন্দোলনেরও একজন নেতা।

* * *

✦ মধ্য কলকাতায় বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলেন দলের কর্মীরা। বামপন্থী এক ব্যক্তি লিফলেটটি হাতে নিয়ে বললেন, অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবি আপনারা প্রথম দাবি হিসেবে রেখেছেন— এটা আপনাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্য বড় দলগুলি যখন এটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেগে দিয়ে চুপচাপ হয়ে গেছে তখন আপনাদের এই ভূমিকা আমাকে সত্যিই অবাক করেছে। আপনারা যেন আমার ঘরের মেয়ের ন্যায়বিচারের দাবিকেই তুলে ধরেছেন। আপনারা এগিয়ে চলুন। সাথে থাকার চেষ্টা করব।

* * *

✦ ট্যাংরা এলাকায় মহামিছিলের প্রচার চলছিল। মাইকের প্রচার শুনে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে দলের এক কর্মীকে বললেন, আন্দোলনটা আপনারাই করছেন। আমি একটি বামপন্থী দলের লোকাল কমিটির সদস্য। কিন্তু এটা আমি এখন স্পষ্ট বুঝে গিয়েছি, আমাদের দল আর আন্দোলনের রাস্তায় যাবে না। কর্মীটি বললেন, এস ইউ সি আই (সি)-ই তো আপনার মতো যথার্থ বামপন্থী মানুষদের সঠিক জায়গা। উত্তরে তিনি বললেন, এই জন্যই এখনও অন্য কোনও দলে যাইনি। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ২১ জানুয়ারি মিছিলে যোগ দিতে তিনি হেদুয়াতে আসবেন বলে জানালেন।

একুশের আহ্বান

সেদিন একুশে জানুয়ারির মহামিছিলের প্রচার করতে গিয়ে এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। আর জি করের ঘটনার সাথে জড়িত দোষীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পাওয়ায় এখনও মানুষের মধ্যে কতখানি ক্ষোভ রয়েছে, তা দেখা গেল এক মাধ্যমিক পড়ুয়া ভাইয়ের মধ্যে। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ স্টেশনে আমরা কয়েকজন কর্মী লিফলেট নিয়ে মহামিছিলের প্রচার করছিলাম।

আমাদের আবেদন শুনে তরুণ ছাত্রটি দাঁড়িয়ে পড়ে এবং জানতে চায় ‘আমার দিদির’ অর্থাৎ অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিই আমরা তুলছি কি না। লিফলেটের প্রথম দাবি অভয়ার ন্যায়বিচার দেখে ছেলেটি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু তার দুঃখ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় কলকাতা যেতে পারবে না। দেখলাম ছেলেটির চোখ দুটি ছলছল করছে। বলল, দিদি আমার মনে হয় ছাত্রদের পড়াশোনার পাশাপাশি দেশের মা-বোনদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এই আন্দোলনগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। প্রথমে ভাবতাম পুলিশ মিলিটারিরা দেশসেবার কাজ করে। তাই ভাল করে পড়াশোনা করে পুলিশ মিলিটারি হয়ে দেশসেবা করব। কিন্তু আর জি করের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা দেখে মনে হল পুলিশ-মিলিটারিরা শাসক দলের কথামতোই উঠবোস করে। এখন মনে হচ্ছে, সাধারণ মানুষের বাঁচার একটাই পথ— আন্দোলন। তাই নিজেকে একজন আন্দোলনকারী হিসেবেই ভবিষ্যতে গড়ে তুলতে চাই। দিদি, এখন এইসব কথা শোনার মতো লোকের সময়ের বড় অভাব। তুমি যে সত্যিকারের দিদির মতো আমার কথা এতটা সময় দিয়ে শুনলে তার জন্য ধন্যবাদ। এর পর ছেলেটি আমাকে প্রণাম করে এবং তার দু’চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় বারবার বলে যায়, দিদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। তোমাদের খুব প্রয়োজন আমার জীবনে।

ছেলেটির সাথে কথা বলে নিজের মধ্যে কাজ করার নতুন প্রেরণা পেলাম। মনে হয় একুশে জানুয়ারি শুধুমাত্র একটা মহামিছিল নয়, একটা ‘একুশের আহ্বান’। এই মহামিছিলের দিকে চেয়ে আছে হাজার হাজার মানুষ, তাদের কাছে মহামিছিলের বার্তা পৌঁছানো খুবই জরুরি।

মোবাস্বরা খাতুন, উত্তর দিনাজপুর

বছরে ২০০ দিন কাজের দাবি
জব কার্ড হোল্ডার শ্রমিকদের রাজ্য কনভেনশনে

২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল জব কার্ডধারী শ্রমিকদের রাজ্য কনভেনশন। এই কনভেনশনে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন। প্রতিনিধিরা বলেন, দু’বছরের উপর জব কার্ডের কোনও কাজ নেই। সরকার কাজ

দিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, দু’বছর আগে যে কাজ করা হয়েছে আজও বহু ক্ষেত্রে তার টাকা পাওয়া যায়নি।

এ রাজ্যে জব কার্ডের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণ হয়েছে। কুড়ি বছর আগে জব কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল। এখন অনেকেই যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে জব কার্ড করতে চায়। কিন্তু সরকার নতুন করে কোনও জব কার্ড ইস্যু করছে না। একে তো ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি, তার ওপর কোনও কাজ না থাকায় জব কার্ডধারী শ্রমিকরা চরম সংকটের মধ্যে আছেন। কনভেনশনে দাবি উঠেছে, বছরে ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি এবং প্রত্যেক ষাটোর্ধ্ব জব কার্ডধারী শ্রমিককে মাসিক ১০ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে।

প্রধান বক্তা এ আই কে কে এম এস-এর সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর ১০০ দিনের প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে যাচ্ছে। এ বছর বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা কমিয়েছে। আজ প্রয়োজন কৃষক-খেতমজুরের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। সেই আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে আন্দোলনের হাতিয়ার গ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে হবে। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড রঙ্গলাল কুমার। কনভেনশন থেকে ইয়াহিয়া আখন্দকে সভাপতি ও মানস সিংহকে সম্পাদক করে ৪১ জনের রাজ্য কমিটি তৈরি হয়।

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ২৮ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডে পূর্ব সিংভূম জেলাশাসক দফতরে বিক্ষোভ দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেয় এআইডিএসও। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভম ঝা।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের কোলাঘাট ব্লক সম্মেলন

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সুনির্দিষ্ট কোর্স ও সিলেবাস অনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিক ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করে সার্টিফিকেট প্রদান এবং সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায়

স্থায়ীভাবে নিয়োগের দাবিতে গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই) কোলাঘাট ব্লক শাখার উদ্যোগে চতুর্থ ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩১ ডিসেম্বর কোলাঘাটের অভিনন্দন লজে। সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের ব্লক সভাপতি মোজাফফর আলি খান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন, সহকারী সম্পাদক দিলীপ মাইতি।

মূল বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল (ছবি)। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কোলাঘাট ব্লকের বি ডি ও অর্ঘ্য ঘোষ, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্পাদক ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাস, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, জেলা সম্পাদক রামচন্দ্র সাঁতরা, ডাঃ বেলাল হোসেন, কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ ভাস্কর রায়, ডাঃ এস পি হাজরা প্রমুখ। ছিলেন সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের কোলাঘাট ব্লক কমিটির কার্যকরী সভাপতি নারায়ণচন্দ্র নায়ক, রাজ্য কোষাধ্যক্ষ ডাঃ তিমির কান্তি দাস, জেলা কমিটির সভাপতি অর্জুন ঘোড়ই প্রমুখ। ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে দুই শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক সম্মেলনে যোগদান করেন।

মোজাফফর আলি খানকে সভাপতি, নিতাই বেরাকে সম্পাদক করে ৩৩ জনের শক্তিশালী কোলাঘাট ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বলি সিরিয়া

আল কায়েদা, আইএস ঘনিষ্ঠ বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম বা এইচটিএস-এর হাতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গত ৮ ডিসেম্বর দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ। সফল হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্র। বাস্তবে সিরিয়া দখলের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর ব্রিটেন, ইজরায়েল সহ তুরস্কের বিপুল মদতে পুষ্ট এইচটিএস এমন একটি মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষাতেই ছিল। কারণ, সিরিয়ার পুরনো বন্ধু রাশিয়া ইউক্রেনে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় এই মুহূর্তে সিরিয়ার পাশে থাকতে পারেনি। সিরিয়ার আর এক বন্ধু দেশ ইরানও সম্প্রতি ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে বিরোধের ধাক্কা সামলাতে ব্যতিব্যস্ত। আবার লেবাননের হিজবুল্লা গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতৃত্ব ইজরায়েলের আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়ায় তারাও এই সময়টায় সিরিয়ার পাশে থাকতে পারেনি। এই অবস্থায় বস্তুত প্রায় বিনা প্রতিরোধেই এইচটিএস সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস দখল করে নিল। পাশাপাশি উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলের সেনাবাহিনীও গোলান হাইটস থেকে শুরু হওয়া বাফার এলাকা ছাড়িয়ে সিরিয়ার ভিতরে প্রবেশ করে আত্মরক্ষার নামে সিরিয়ার খানিকটা অংশ দখলের মতলব হাসিল করতে চাইছে। ফলে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, প্যালেস্টাইনের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসরদের মুকুটে সিরিয়া নামক নতুন পালক যুক্ত হল।

কেন সিরিয়ার দিকে শকুন-নজর সাম্রাজ্যবাদীদের ?

ইরাক বা ইরানের মতো তেলের বিশাল মজুত ভাণ্ডার নেই সিরিয়ায়। তা সত্ত্বেও পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটিকে কব্জা করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা দীর্ঘদিন ধরে উন্মুখ। কেন? আসলে নিজের নিজের দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে গোটা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে তেল ও গ্যাসের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখলদারি কায়েম রেখে ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তা বিক্রির পুরো নেটওয়ার্ক নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে সিরিয়ার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৌদি আরব ও ইরাকের তেলের পাইপলাইন সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যে দিয়ে গেছে। পারস্য উপসাগরের ঠিক মাঝখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের যে সর্ববৃহৎ ভাণ্ডারের খোঁজ পাওয়া গেছে, সেখান থেকে গ্যাস তোলার জন্য ২০১১-র জুলাই মাসে ইরান, ইরাক ও সিরিয়ার একটি চুক্তি হয়। এর জন্য প্রস্তাবিত পাইপলাইনটি পারস্য উপসাগরে ইরানের একটি বন্দর থেকে শুরু হয়ে ইরাকের মধ্যে দিয়ে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে যাওয়ার কথা। এই চুক্তির ঠিক পরে পরেই আসাদ সরকার সিরিয়ায় একটি গ্যাস-কূপ আবিষ্কৃত হওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং রাশিয়ার একটি কোম্পানিকে এই নতুন আবিষ্কৃত ক্ষেত্রটিতে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়। এ দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তেল বিক্রির বাজার যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সেখানে তেল সরবরাহ করার লক্ষ্যে ইরান দামাস্কাস থেকে লেবানন পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার পরিকল্পনা করে।

প্রমাদ গোনে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার তেলের দৈত্যাকার বহুজাতিক কোম্পানি আর ব্যাঙ্কগুলি। তাদের ভয় আর এক সাম্রাজ্যবাদী দেশ রাশিয়াকে। নিজের প্রভাব বাড়িয়ে রাশিয়া যদি সিরিয়া ও সন্নিহিত এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও পাইপলাইনগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে নেয়, তা হলে পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আধিপত্য ধাক্কা খাবে— এই তাদের আশঙ্কা। তাদের আরও ভয়, প্রভাব কমে যাওয়ার পরিণামে পশ্চিম এশিয়ার নানা জায়গায় মোতায়েন মার্কিন সেনাদের যদি প্রত্যাহার করে নিতে হয়, তাহলে রাশিয়া ও চিন বিশ্বের তেলের বাজারগুলিতে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করবে, কমবে আমেরিকার ক্ষমতা। এমন হলে পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন বিরোধী দেশ হিসাবে রাশিয়ার মদতপুষ্ট ইরানের ক্ষমতাও বাড়বে। ফলে সিরিয়ার উপরে দীর্ঘদিন ধরেই শকুনের নজর ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসরদের। মতলব ছিল যেনতেনপ্রকারেণ সেখানে তাঁবেদার সরকার বসিয়ে ইরাক, আফগানিস্তানের মতো সাম্রাজ্যবাদী লুঠ চালানোর।

সিরিয়া দখলের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

ইতিহাস বলছে, ২০০৯ সালের আগে পর্যন্ত সিরিয়ার আসাদ সরকারের সঙ্গে আমেরিকা ও তার সাম্রাজ্যবাদী দোসর দেশগুলির সম্পর্ক খুব একটা খারাপ ছিল না। রাশিয়া ও ইরানকে চাপে রাখতে সিরিয়ার মাটিতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বসানোর প্রস্তাব সিরিয়া প্রত্যাখ্যান করায়, এই সময়ের পর থেকে আমেরিকার সঙ্গে সিরিয়ার সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের দেশগুলির যোগাযোগের পথের উপর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ কায়েমের চেষ্টা নিয়েও সিরিয়ার সঙ্গে সমস্যা তৈরি হয় মার্কিন সরকারের। কোনও মতেই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে মাথা নত করে নিজেদের শর্তে রাজি করাতে না পেরে ইরাক ও লিবিয়ার মতো করেই 'সিরিয়ায় গণতন্ত্র বিপন্ন' ধুয়া তুলতে থাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সুর মেলায় তার দোসররা। অর্থ, অস্ত্র সহ সমস্ত ধরনের সাহায্য দিয়ে তারা তৈরি করে 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি' (এফএসএ) নামে একটি গোষ্ঠী। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে প্রেসিডেন্ট আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে এই গোষ্ঠী আসাদ সরকার ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়। এদের সঙ্গে যোগ দেয় ইসলামি সন্ত্রাসবাদী আল কায়েদা ও আইএস-ঘনিষ্ঠ নানা গোষ্ঠী। ২০১১ থেকে সিরিয়ায় শুরু হয় ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ওই এলাকায় তার ঘনিষ্ঠ তুরস্ক টাকা, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী করে গেছে এফএসএ-র সঙ্গে সঙ্গে আল কায়েদার মতো ধর্মান্ধ সন্ত্রাসবাদী নানা গোষ্ঠীকে। আসাদ সরকারকে দুর্বল করতে তারা ১০ হাজারেরও বেশি ভাড়াটে সেনা পাঠায় সিরিয়ার

ছয়ের পাতায় দেখুন

নন্দকুমার বিদ্যুৎ দফতরে গ্রাহকদের বিক্ষোভ

কানেকশনের লোডবৃদ্ধির নাম করে অতিরিক্ত সিকিউরিটি বাবদ বিরাট অঙ্কের টাকা বিদ্যুৎগ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় বন্ধ করা, স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ৩ জানুয়ারি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটির উদ্যোগে স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

স্টেশন ম্যানেজারকে সাত দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

একের পাতার পর

পাশফেল প্রথম শ্রেণি থেকেই

এবং আনন্দ হাণ্ডাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯৯ জনের শক্তিশালী রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।

আকাশ ভবন, ঝাড়গ্রাম

ইতিহাস কংগ্রেস উপলক্ষে
পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুকস্টল

পাঞ্জাবে পাতিয়ালার পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮-৩০ ডিসেম্বর ৮৩তম ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সেখানে বুকস্টলের আয়োজন করে ছাত্রসংগঠন এআইডিএসও। সারা দেশ থেকে এক হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ কংগ্রেস উপলক্ষে বুকস্টলে আসেন। তাঁরা রাজনৈতিক নানা বিষয়ের উপর বই ছাড়াও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিশ্লেষণমূলক বই সংগ্রহ করেন। মোদি সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র আন্দোলনকে তারিফ করে আন্দোলন তহবিলে ডোনেশনও দেন অনেকে। ইতিহাস কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন এআইডিএসও-র প্রাক্তন সভাপতি ভি এন রাজশেখর এবং দিল্লি রাজ্যের এআইএমএসএস-এর সেক্রেটারি ঋতু কৌশিক। কংগ্রেসে আগত আমেরিকার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রিচার্ড এটনকে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু বইপত্র উপহার দেওয়া হয়।

পাঠকের মতামত

কর্মক্ষেত্রে হয়রানি

গণদাবী ৭৭ বর্ষ ২০ সংখ্যায় ‘কর্মক্ষেত্রে হয়রানির শিকার ৭০ শতাংশ কর্মচারী’ শীর্ষক প্রবন্ধে বর্তমানে তথাকথিত ‘হোয়াইট কলার’ কর্মচারীদের উপর যে কর্মক্ষেত্রের চাপ, মানসিক পীড়ন, হতাশা, চাকরি হারানোর আশঙ্কা কাজ করে, তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাজের ঘণ্টার যে কী ভয়াবহ অবস্থা, আমি একজন চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে কিছুটা জানি। এর সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্টে কর্মরত বন্ধুদের অবস্থা কিছুটা অনুভব করে আমার অভিজ্ঞতা লেখার চেষ্টা করছি।

এই হয়রানি ট্রেনি জীবনের গোড়া থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথম বর্ষের ট্রেনিদের উপর অপেক্ষাকৃত সিনিয়রদের চাপসৃষ্টির একটা পর্ব চলে। বাস্তবে এই সিনিয়র ট্রেনিরাও একই রকম অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু চাপ নিবারণের জন্য চেষ্টা না করে তা অন্যের ঘাড়ে স্থানান্তরের ফল কী দাঁড়ায়?

এর ফলে প্রথম বর্ষের নতুন ট্রেনিরা চূড়ান্ত হতাশ, বিরক্ত, কাজের ভারে ন্যুব্জ-কুব্জ হয়ে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর যারা ভেবেছিল ‘এবার রেহাই পেলাম’, সেই সিনিয়ররাও অন্যান্য বিভিন্ন রকম বিষয়ের মাকড়সার জালে জড়িয়ে যায়। যে সব সাধারণ মানুষ এই সমস্ত ট্রেনিদের থেকে পরিষেবা পেতে পারতেন এবং ট্রেনিরাও এই পরিষেবা দিতে পেরে খুশি হতে পারতেন— তার কোনওটাই হতে পারে না। এই যে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া, ধমকানো বা মানসিক ভাবে অত্যাচার করার প্রবণতা, তার কারণ হিসাবে আমার মনে হয়, প্রফেশনাল কোর্সগুলোর ভিতরে যে নৈতিকতা, মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ, আদর্শ রয়েছে, সেখান থেকে আমাদের বহু দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার সামাজিক-মানবিক দিকগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিক্ষাপ্রণালী শুধুমাত্র এগুলোর টেকনিক্যাল-মেকানিক্যাল দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কেরিয়ার-সর্বস্ব মানুষ তৈরি করছে। এই যে আদর্শহীনতা, যেভাবেই হোক কম্পিটিশনে জেতার প্রবণতা, এটা যে মানুষকে মনুষ্যত্বহীন জানোয়ারে পরিণত করে ফেলে, তা বোঝার বা বোঝানোর মতো প্রতিস্রোত বর্তমানে তৈরি করা হল সময়ের দাবি।

এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তার নিজের সর্বোচ্চ মুনাফার চক্করে, একদিকে বিভিন্ন উপায়ে মানুষের শ্রমশক্তি নিংড়ে নিচ্ছে— যার মর্মস্পর্শী বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে নীতি-আদর্শহীন, আত্মসর্বস্ব, বৈভবপূর্ণ জীবনের, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহের মধ্যে যুবক-যুবতীদের আটকে ফেলছে। এই সত্য আমরা যে যতটুকু বুঝতে পারছি, এই অবস্থার পরিবর্তনে তাদের প্রত্যেককে ততটুকু করে নিজের ভূমিকা নিতে হবে।

একটা নির্দিষ্ট পরিসরের সমস্ত রকম শ্রমিক— ঝাড়ুদার থেকে অফিসার যখন একটা উন্নত সংস্কৃতি চর্চা করবে, ঐক্যবদ্ধ হবে এবং বর্তমান এই চূড়ান্ত অত্যাচারী শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার চেষ্টা করতে থাকবে, সেই সময় থেকে এই অবস্থার এবং কর্মচারীদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে।

ডাঃ ভরত দাস, দিল্লি

সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বলি সিরিয়া

পাঁচের পাতার পর

দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পোতে। দেশ জুড়ে চলতে থাকে গৃহযুদ্ধ। ধীরে ধীরে সিরিয়ার এক-তৃতীয়াংশ তেলসমৃদ্ধ ও কৃষিবহুল অঞ্চল এই গোষ্ঠীগুলির দখলে চলে আসে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট এই গৃহযুদ্ধে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান। প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস্তুহারা হন।

দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্বক্ষেত্র

দেশের ভিতরে বিপুল সংখ্যায় তথাকথিত বিদ্রোহীর প্রবেশ ঘটিয়ে, বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে নানা ভাবে মদত দিয়ে গৃহযুদ্ধে সিরিয়াকে রক্তাক্ত করে তুলেও সাম্রাজ্যবাদীরা আসাদ সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি। শত সমস্যা সত্ত্বেও সিরিয়ার সাধারণ নাগরিক সেই সময়ে আসাদ সরকারের পিছনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় নিজেদের শর্তের কাছে প্রেসিডেন্ট আসাদের মাথা নত করাতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। তা ছাড়া, রাশিয়া তখন নিজের সামরিক শক্তি নিয়ে আসাদ সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত রাশিয়া, পশ্চিম এশিয়ায় আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে আড়াল করে রেখেছিল সিরিয়াকে। ইরানকে পাশে নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিস্পর্ধী আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-অক্ষ তৈরির চেষ্টা ছিল রাশিয়ার। এই অবস্থায় কঠোর বিধিনিষেধ চাপিয়ে সিরিয়ার জনজীবনকে বিপন্ন করার চেষ্টা চালায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বিপরীতে রাশিয়াও নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সিরিয়ায় খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে থাকে। সব মিলিয়ে সিরিয়া হয়ে দাঁড়ায় দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্বের একটি ক্ষেত্র।

নিজের জোরে সিরিয়া কেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারল না

কিন্তু প্রশ্ন হল, যে সিরিয়া নিজের সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করেছে, প্রবল পরাক্রমী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসরদের চাপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, বন্ধু দেশগুলি সরে যাওয়ামাত্র এইচটিএস সেই সিরিয়াকে দখল করে নিতে পারল কী করে!

সিরিয়া ছিল প্রেসিডেন্ট আসাদের শাসনাধীন একটি আধা-রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্র, যা বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের নামান্তর। আরব মুসলমান, কুর্দ, তুর্কি, আসিরীয়, আর্মেনীয় সহ নানা উপজাতির মানুষের এই দেশটিতে খুব স্বাভাবিক কারণেই শাসক শ্রেণির শোষণ-নিপীড়ন ছিল। গরিবি-বেকারিতে বিপর্যস্ত সিরিয়ায় বেকারত্বের হার ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে ছিল। ২০২৩-এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের অন্যতম প্রধান শহর আলেপ্পোতে পর্যাপ্ত আয় না থাকায় ১১ শতাংশের বেশি পরিবার নাবালক সন্তানদের রোজগারের কাজে লাগিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দেশের এ হেন পরিস্থিতিতে শাসকের প্রতি জনসাধারণের ক্ষোভ থাকাই স্বাভাবিক। সেই ক্ষোভ থেকে তাদের অনেকেই হয়ত আসাদ-জমানার অবসান চেয়ে থাকবেন। আবার অনেকে হয়তো ভেবেছিলেন, সিরিয়ার সরকারি সেনাবাহিনী ‘রিপাবলিকান গার্ড’ এইচটিএস-এর হামলা রুখে দিতে পারবে। কিন্তু দেখা গেল, রাশিয়া ও ইরান সরে যেতেই রিপাবলিকান গার্ড তথাকথিত এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করে বসল। এতে বোঝা যায়, গৃহযুদ্ধের সময়ে আসাদ সরকারে প্রতি জনসাধারণের যে আস্থা-ভরসা ছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়নে বিপর্যস্ত হতে হতে সে আস্থা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন, যার প্রভাব পড়েছে সেনাবাহিনীর মনোবলের উপরেও।

এইচটিএস কি কোনও গণতান্ত্রিক শক্তি?

গণতন্ত্র বিপন্ন— এই ধুয়া তুলে ইরাক, লিবিয়ার মতো পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে যে ভাবে নির্মম আগ্রাসন চালিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্যাঙাৎরা, সেখানকার নির্বাচিত সরকার ফেলে দিয়ে কায়েম করেছে নিজেদের আজ্ঞাবাহী পুতুল সরকার, ঠিক তেমন ভাবেই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের স্বৈরাচার নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুগত প্রচারমাধ্যম। প্রেসিডেন্ট আসাদকে প্রায় রক্তচোষা দানব হিসাবে বিশ্বের সামনে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা চালিয়েছিল তারা। বারবার তাদের মিথ্যা ধরা পড়ে গেছে, তবুও তাদের অপপ্রচারে ভাটা পড়েনি। সিরিয়াতেও তাদের পুরনো কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হিসাবে বিশ্বের চোখে প্রতিষ্ঠা করতে তথাকথিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী তথা ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের সর্বতোভাবে মদত করে গেছে তারা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই এইচটিএস কি কোনও গণতান্ত্রিক শক্তি? এই গোষ্ঠীর জন্ম তো জাভাত আল-নুসরার গর্ভে, যা আসলে আল-কায়দার সিরীয় শাখা! সেই আল-কায়দা— যাকে কব্জা করার নাম করে ঐতিহ্যশালী আফগানিস্তান দেশটিকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজের দোসরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আইএস-এর সঙ্গেও এইচটিএস-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ক্ষমতা দখল করে সিরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কোনও পরিকল্পনা এইচটিএস-এর নেই, তারা দেশটিকে একটি ইসলাম-ধর্মীয় দেশ বানাতে চায়। এ পর্যন্ত তাদের প্রকাশিত কোনও বিবৃতিতেই ‘গণতন্ত্র’ শব্দটির উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক ও সৌদি আরব স্বীকার করতেও দ্বিধা রাখেনি যে তারা সিরিয়ায় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। সিরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কতখানি ব্যগ্র, এর পরেও তা বুঝতে অসুবিধা থাকে কি?

সিরিয়ার ঘটনা যে শিক্ষা রেখে গেল

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বাস্তবেই ভয়ঙ্কর। গোটা পশ্চিম এশিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েল, সৌদি আরব সহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নির্মম আক্রমণে গোটা অঞ্চলের মাটি আজ রক্তাক্ত। একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার স্বার্থে এই বীভৎস সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বলি হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ মানুষ। আহত হচ্ছেন অসংখ্য। নিজের বাসভূমি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষ। সাম্রাজ্যবাদের মুনাফার ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলতে প্রতি মুহূর্তে প্রবল গরিবি ও দুর্দশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছেন খেটে-খাওয়া মানুষ। বিশ্বে যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল, তাদের প্রভাবে পশ্চিম এশিয়ায় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষের শক্তিগুলি আদর্শগত ও অন্যান্য মদত পেতে পারত। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিকল্পনা করে ইরাক, আফগানিস্তানকে ধ্বংস করে এই শক্তিগুলির অস্তিত্বকেই কবরে পাঠানোর কাজ শুরু করে।

এ থেকে রেহাই পাওয়ার রাস্তা কী? মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা আজ পশ্চিম এশিয়া জুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে, তা রুখতে হলে প্রয়োজন দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী, শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক চেতনা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত জোট। দরকার শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করা, পুঁজিবাদের যথার্থ বিকল্প সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইকে জোরদার করতে আজ সময়ের আহ্বান হল বিশ্বের দেশে দেশে, এলাকায় এলাকায় ঐক্যবদ্ধ, লাগাতার সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা। সমস্বরে আজ আওয়াজ তুলতে হবে— ‘সাম্রাজ্যবাদ সিরিয়া থেকে দূর হঠো’।

মিড-ডে মিল কর্মীদের সম্মেলন

মিড-ডে মিল কর্মীদের সরকারি স্বীকৃতি, বেতন বৃদ্ধি ও ১২ মাসের বেতন, ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ ১৩ দফা দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পাঁশকুড়া ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রতাপপুর জুনিয়র বেসিক স্কুলে (ইউনিট-২)। মিড-ডে মিল কর্মীদের জীবন-যন্ত্রণা ও তার সমাধান নিয়ে সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদিকা অঞ্জলি মান্না। সম্মেলনে রেবতী মান্নাকে সভানেত্রী, রাখী বেরাকে সম্পাদিকা ও সুপর্ণা জানা মাইতিকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

পিছনের দরজা দিয়ে তিন কালা কৃষি আইন চালুর চেষ্টা

তিনের পাতার পর

থেকে এটা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলো লাভবান হয়েছে, তাদের সমৃদ্ধি বেড়েছে। অভিযোগ যে, বিমা কোম্পানিগুলো বিমা বাবদ দেওয়া অর্থের ৯৭ শতাংশ আত্মসাৎ করেছে। বাস্তবে ফসল বিমায় ক্ষতিপূরণের জন্য কৃষকদের দাবির মাত্র ৬.৬১ শতাংশ নিষ্পত্তি হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, মাত্র বারো টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সুতরাং খুব সহজেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই বিমা যোজনাও বিশ্বায়ন অর্থনীতির আরেকটা মুখোশ, যা জনসাধারণের করের টাকায় 'কৃষক-বন্ধুর' আলখাল্লা পরে বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলির পেট ভর্তি করবে।

কর্পোরেটরা এলে কী ক্ষতি

এই যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, এতে ব্যাপক সংখ্যায় কৃষক ধ্বংস হয়ে ভূমিহীন মানুষে পরিণত হবে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দোকানদার বাজার থেকে বিতাড়িত হবে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সমস্ত খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। যার ফলে সমস্ত জিনিসের দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। এর বিপর্যয়কারী পরিণতির কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ইতিমধ্যেই আদানি কোম্পানি হিমাচলপ্রদেশে কৃষকের কাছ থেকে ১৮ টাকা কেজি দরে আপেল কিনে সেই আপেল দিল্লিতে বিক্রি করেছে কেজি প্রতি ২৪০ টাকায়। এই বছর কাশ্মীরে আপেল চাষিরা ২৫ কেজি আপেলের প্যাকেট বিক্রি করেছে ৪৫ টাকায়। ক্রেতা আদানি কোম্পানি। বাজারে এই কাশ্মীরী আপেল কী দামে বিক্রি হয় তা মানুষ জানেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এইভাবে কৃষকের সর্বনাশের বিনিময়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থ রক্ষা করে যেতে চাইছে।

খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কেন জরুরি

খাদদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য— এর প্রকৃত অর্থ কী? এর দুটো অংশ আছে। প্রথমত, এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করে সমস্ত কৃষিপণ্য সরকারকে কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদন খরচের অন্তত দেড়গুণ অর্থাৎ C2+50% দামে কিনতে হবে।

দ্বিতীয়ত সাধারণ জনগণ যে দামে কিনতে পারে তেমন সস্তা দামে খাদ্যপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরকারকে গণবণ্টন ব্যবস্থার (পিডিএস) মাধ্যমে জনগণের কাছে বিক্রি করতে হবে। এর জন্য কিছু ভর্তুকির প্রয়োজন হলে সরকারকে অবশ্যই তা দিতে হবে। কারণ, একটা সভ্য সরকারের প্রাথমিক কাজ হল তার নাগরিকদের খাবারের সংস্থান করা, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করা নয়। কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকার জনগণের জন্য তা করতে রাজি নয়। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারও তা করেনি এবং এখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও করছে না। বরং মোদি সরকার বর্তমান বিপণন ব্যবস্থা ধ্বংস করে সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রটি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে।

এই সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা কি অসম্ভব কাজ? জনগণের স্বার্থ ভাবলে এটা অসম্ভব নয়। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও তা করা সম্ভব। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অনেক মিথ্যা যুক্তির অবতারণা করেছে। তারা বলছে, এমএসপি চালু করতে প্রচুর টাকা লাগবে। সরকারের কোষাগারে অত টাকা নেই। এই রকম একটা অর্থনৈতিক সংকটের সময় এত টাকা ব্যয় করা কি সম্ভব? সরকারের এই সব কথায় একদল মানুষ বিভ্রান্তও হচ্ছেন। তারা আরও বলছে, সরকার যদি সমস্ত কৃষিদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী C2+50% হারে ক্রয় করে, তা হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অনেক বেড়ে যাবে, যার ফলে সাধারণ জনগণ প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়বে। সুতরাং যারা এমএসপি চালু করার পক্ষে ওকালতি করছে তারা সাধারণ জনগণ এবং শ্রমিক বিরোধী কাজ করছে।

সরকারের কুযুক্তি

সরকারের যুক্তিগুলো এক এক করে বিচার করে দেখা যাক। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর দাম হু-হু করে বাড়ছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এর বিষময় প্রভাব দেশের মানুষ জীবনে অনুভব করছে। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে কেন? কেন শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর দাম লাফিয়ে বাড়ছে? কেন পেট্রল ডিজেলের দাম প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে? কৃষকরা আলু বিক্রি করছেন ৪-৫ টাকা কিলো দরে আর পেঁয়াজ বিক্রি করছেন ৩-৪ টাকা কিলো দরে। সেই আলু ও পেঁয়াজ এখন বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে যথাক্রমে ৩৫-৪০ এবং ৬০-৭০ টাকা কিলো দরে। কেন এ রকম হচ্ছে? এ সব কি এমএসপি-র জন্য হচ্ছে? আদৌ তা নয়। তা হলে দাম বাড়ছে কেন? বাড়ছে, কারণ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা। বাস্তবে এদের ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকারের কোনও জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। পুঁজিপতিরা ইচ্ছামতো দাম বাড়াচ্ছে, আর ইচ্ছামতো মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে। এই হল মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণ। ফলে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হলে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীকে ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে, সরকারকেই এই ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং জনগণকে তা সরবরাহ করতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। কিন্তু সরকার সে পথে হাঁটছে না বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে।

এখন আসা যাক টাকার অভাবের প্রশ্নে। এমএসপি চালু না করার পেছনে সরকার অর্থ-সংকটের যুক্তি তুলছে। প্রশ্ন হল, কৃষিপণ্যে এমএসপি চালু করতে হলে কত টাকা প্রয়োজন? হিসাবটা দেখা যাক। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ২৩টি কৃষিপণ্যে এমএসপি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই ২৩টি কৃষিপণ্যের মধ্যে আছে ৭ ধরনের দানা শস্য (চাল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি), ৫ ধরনের ডাল (মুগ, মুসুর ইত্যাদি) , ৭ ধরনের তৈলবীজ (সরষে, বাদাম ইত্যাদি), আর আছে ৪ ধরনের বাণিজ্যিক ফসল (আখ, পাট, তুলো ইত্যাদি)। সরকার যদি ২৩টি কৃষিপণ্য পুরোটাই এমএসপি দরে কিনে নেয় তা হলে তার বছরে খরচ হবে ১০.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা। যদিও ২৩টি কৃষিপণ্য যতটা উৎপাদন হয় তার সবটা বাজারে আসে না। কারণ, কৃষকরা উৎপাদিত দ্রব্যের একটা অংশ নিজেরা ভোগ করে। একটা অংশ পরের বছরের বীজের জন্য রেখে দেয় এবং একটা অংশ পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। কোন কোন কৃষিপণ্যের কী পরিমাণ বাজারে আসে তার হিসাবটা মোটামুটি এই রকম— ১) গমের ৭৫ শতাংশ, ২) চালের ৮০ শতাংশ, ৩) আখের ৮৫ শতাংশ, ৪) অধিকাংশ ডালের ৯০ শতাংশ, ৫) তুলা ও পাটের ৯৫ শতাংশ। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের গড়ে ৭৫ শতাংশ বাজারে এলে সব কিনে নিতে সরকারের খরচ হবে ৮ লক্ষ কোটি টাকার সামান্য বেশি। আখকে এই হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ, আখ কেনে চিনিকল মালিকরা এবং দাম তাদেরই দেওয়ার কথা। সরকারকে শুধু লক্ষ রাখতে হবে যাতে চিনিকল মালিকরা সময়মতো কৃষকদের পাওনা মিটিয়ে দেয়।

আবার যতটা তুলো ও পাট উৎপাদন হয় তার সবটা কিনে নেওয়ার দরকার নেই। সরকার যদি মোটামুটি অর্ধেক পাট বা তুলো কেনে তা হলে বাজারে তার বিরাট প্রভাব পড়বে এবং খোলাবাজারে কৃষক লাভজনক দাম পাবে। ২০২৩-২৪ সালে দেশে তুলো উৎপাদিত হয়েছিল ৩৩২.৫০ লক্ষ বেল। তার মধ্যে সরকার কিনে নিয়েছে মাত্র ৩২.৮১ লক্ষ বেল। এর ফলে খোলাবাজারে খুব বেশি প্রভাব পড়েনি তাই কৃষকরা খুব বেশি লাভজনক দামও পায়নি। কিন্তু তুলো বা পাট বাজারে আসার অনেক আগেই যদি সরকার ঘোষণা করে যে সে উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দামে শতকরা ৫০ ভাগ কিনবে, তা হলে তা খোলাবাজারে কৃষককে লাভজনক দাম পেতে সাহায্য করবে।

এখন এই প্রক্রিয়ায় সরকার যেসব খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য কৃষকদের কাছ থেকে কিনে নেবে, তা দিয়ে সে কী করবে? সরকার তা সাধারণ মানুষকে সরকারি ব্যবস্থায় কম দামে বিক্রি করবে। এই বিক্রির ফলে সরকারি ভাণ্ডারে একটা বিরাট পরিমাণ টাকা জমা পড়বে, সরকারের আর্থিক দায়িত্ব অনেকটাই কমবে এবং জনসাধারণ কম দামে খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী পাবে। এইটুকু যদি সরকার করতে না পারে তাহলে সরকারটা আছে কী করতে? এমএসপি চালু করতে সরকারি কোষাগার থেকে কত টাকা বাড়তি খরচ হবে? এমএসপি যতটুকু চালু আছে তার জন্য বর্তমানে সরকারের খরচ হয় ৩.২ লক্ষ কোটি টাকা। হিসাব করে দেখা গেছে এর উপর সরকারের বাড়তি খরচ হতে পারে মাত্র দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার জনারদণ্ডী সাংগঠনিক লোকাল কমিটির বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড শ্যামাপদ রাউৎ ১৮ নভেম্বর প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে পুরুলিয়া জেলার কৃষক আন্দোলনের শহিদ কমরেড রামযতন সিং-এর সংস্পর্শে এসে কমরেড শ্যামাপদ রাউৎ দলের আদর্শে প্রভাবিত হন। তখন থেকেই স্থানীয় পার্টি কর্মসূচিতে সাধ্যমতো থাকতেন এবং জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে এলাকায় সাহায্য করতেন। সেই সময় মেকাতলা তরুণ সংঘ ক্লাবের সদস্য হিসাবে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শ্যামাপদ রাউৎ ছিলেন সাহসী, উদ্যোগী এবং দায়িত্বশীল। খুবই স্পষ্টবাদী এই মানুষটি তাঁর খুব প্রিয়জনের ত্রুটিও পার্টি নেতাদের কাছে তুলে ধরতেন। সাধারণ মানুষের জন্য যে কোনও দায়িত্ব হাসিমুখে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। গ্রামে ও এলাকায় অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ লড়াই ছিল। পার্টির জেলা কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড কুশধ্বজ মণ্ডল ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে তাঁকে কাজে সাহায্য করার জন্য নিজস্ব উদ্যোগে এগিয়ে আসেন। গ্রামে পানীয় জলের দাবিতে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন তিনি। ক্লাবের ছোটদের সঙ্গে মিশে যে কোনও দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের গভীর ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন অ্যাবেকার নিতুড়িয়া ব্লক কমিটির সদস্য। ১৮ নভেম্বর তাঁর দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামের ও আশপাশের এলাকার মানুষ এবং পার্টিকর্মীরা ছুটে আসেন। বিকালে গ্রামের মানুষ ও পার্টির কর্মী-সমর্থকরা তাঁর মৃতদেহে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

১ ডিসেম্বর মেকাতলা তরুণ সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে কমরেড শ্যামাপদ রাউৎ স্মরণে স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনিল বাউরী বক্তব্য রাখেন।

কমরেড শ্যামাপদ রাউৎ লাল সেলাম

কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলার পাথরপ্রতিমা বিধানসভার দক্ষিণ গঙ্গাধরপুরে দলের সমর্থক কমরেড সুভদ্রা হালদার ১৭ ডিসেম্বর ৫৭ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে প্রয়াত হন। দারিদ্রের কারণে কাজের খোঁজে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কলকাতার কাছাকাছি সোনারপুরে তাঁর পরিবারকে চলে আসতে হয়। সেখানে তিনি বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করতেন। কিন্তু ৫ আগস্ট, ২৪ এপ্রিল বা দলের ডাকে যে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে তিনি কাজের বাড়িতে ছুটি নিয়ে তাতে যোগ দিতেন। আর্থিক অনটনের কারণে তাঁর স্বামী সহ অন্যরা দলের কাজে না যাওয়ার কথা বললে নিজে টাকা জোগাড় করে তাঁদের প্রোগ্রামে যেতে সাহায্য করতেন। তাঁর স্মরণে আলোচনা ও মাল্যদান করেন ভাগচাষি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড কেশব হালদার। অন্যদের সাথে মাল্যদান করেন কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নারায়ণ হালদার এবং জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত পাত্র।

কমরেড সুভদ্রা হালদার লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 22 Bengali Weekly January 10, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

ন্যায়বিচারের দাবিতে জেলায় জেলায় কনভেনশন

বহরমপুর ঃ ৪ জানুয়ারি বহরমপুরে চার শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে আয়োজিত হল 'দ্রোহের বর্ষবরণ'। উপস্থিত ছিলেন জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাত। তিনি বলেন, সমাজের নানা স্তরের মানুষ এই আন্দোলনের আবেদনে একাত্ম হয়ে

বহরমপুর

উঠেছেন। আন্দোলনের এই চরিত্রেই ভয় পেয়েছে শাসক। এই আন্দোলন কোনও নেতার অঙ্গুলিহেলনে গড়ে ওঠেনি, উঠেছে সমাজের গর্ভ থেকে।

ডাঃ অনিকেত মাহাতকে সম্বর্ধনা জানান মুর্শিদাবাদ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্লব বিশ্বাস, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে জেলা সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম। পিএমপিএআই-এর পক্ষ থেকে ডাঃ সামসুল আজাদ, বিজ্ঞান ভাবনার পক্ষ থেকে এ কে এম বজলুল হক ও উত্তরণ সমাজের পক্ষে বিদেশ মণ্ডল। আর জি কর আন্দোলন সংক্রান্ত ঝড় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'বিচার পথের সহযাত্রী' ডাঃ মাহাতর হাতে তুলে দেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুষ্ঠানের অন্যতম আহ্বায়ক চন্দ্রপ্রকাশ সরকার। মঞ্চেউপস্থিত ছিলেন প্রবীণ অধ্যাপক আবুল হাসনাত এবং প্রাণতোষ সেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন 'ঝড়' পত্রিকার সম্পাদক কৌশিক চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন নাট্যকর্মী, পরিচালক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিল্পী, সমাজকর্মী সহ মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের ছাত্র জুনিয়র ডাক্তার ও নার্স।

তমলুক ঃ অভয়ার ন্যায়বিচার চেয়ে ৪ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের শংকর আড়া বাসপুল

তমলুক

এলাকায় গান, আবৃত্তি, আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবাদ সভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান হয় 'আর জি করের পাশে আমরা তমলুকবাসী'র উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ললিত কুমার খাঁড়া, শিক্ষিকা চন্দনা জানা, বন্দনা অধিকারী, সুধাংশু অধিকারী প্রমুখ।

জঙ্গিপুর ঃ ৫ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুলে আর জি কর ঘটনার পর থেকে ঘটে যাওয়া নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে জঙ্গিপুর নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ ডাঃ গৌরাঙ্গ প্রামাণিক। তিনি জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য, অভয়ার সুবিচার এবং জনমুখী স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু ও থ্রেট কালচার সহ স্বাস্থ্যব্যবস্থার নানা দিক তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন সুতি নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিটির সম্পাদিকা ডঃ সংঘমিত্রা গোস্বামী, নৃত্যশিল্পী জঙ্গিপুর কলাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে পিয়ালী বণিক, শিক্ষক মাসুদ হাসান। সভাপতিত্ব করেন শেফালী পাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঊষা সাহিত্য পত্রিকার সভাপতি সুরজিৎ দাস।

রানাঘাট ঃ ১ জানুয়ারি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে অভয়ার বিচারের শপথ দিবস পালিত হল। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বিক্রম দেবনাথ, দীপঙ্কর সরকার, গোলাম নবীন মণ্ডল এবং শপথনামা পাঠ করেন আশারুল মণ্ডল। সঞ্চালক ডাক্তার সত্যজিৎ রায়, সভাপতিত্ব করেন দীপঙ্কর সরকার।

কাঁচরাপাড়া ঃ ১ জানুয়ারি ২০২৫ অভয়ার ন্যায়

কাঁচরাপাড়া

বিচারের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে 'শপথ দিবসে' শপথ গ্রহণ করা হয় ও শেষে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও বীজপুর নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার কাঁচরাপাড়া গান্ধীমোড় ও স্টেশন চত্বরে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। বহু মানুষ স্লোগানে গলা মেলান।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নাগরিক দুর্জয় ব্যানার্জী, ফার্মাসিস্ট শ্যামল দত্ত, ডাঃ শম্ভুনাথ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। শপথপত্র পাঠ করেন সীমা নন্দী।

সখেরবাজার ঃ ৫ জানুয়ারি অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে, প্রশাসন ও সিবিআই-এর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে কলকাতার বেহালায় সখের বাজারে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। উপস্থিত ছিলেন আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডব্লিউবিজেডিএফ-এর ডাঃ অনিকেত মাহাত ও এমএসসি-এর রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র।

বিদ্যুৎগ্রাহকদের কলকাতা জেলা সম্মেলন

২২ ডিসেম্বর থিওজফিক্যাল সোসাইটি হলে অ্যাবেকা কলকাতা জেলার ৫ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এফপিপিএএস-এর নামে অতিরিক্ত সারচার্জ আদায়ের বিরুদ্ধে এবং বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ বৃদ্ধি ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের উপর সুদ না দিয়ে

অতিরিক্ত সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায়ের বিরুদ্ধে, বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানোর দাবিতে এবং সর্বোপরি গ্রাহকদের টাকা লুটের যন্ত্র স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় দেড়শো প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

জেলা সম্পাদক নীরেন কর্মকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কৃষ্ণকান্ত বাগানি। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখেন। সম্মেলনে প্রধান বক্তা অ্যাবেকার রাজ্য সহ সভাপতি অমল মাইতি তাঁর আলোচনায় নানা দিক থেকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে গ্রাহকদের ওপর যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসছে তা ব্যাখ্যা করেন এবং একে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি শিবাজি দে। শিবাজি দে ও নীরেন কর্মকারকে পুনরায় যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার অন্যতম কোলওয়াসারি ভজুডি কোলওয়াসারি গেটে প্রবল শীতের মধ্যেও ন্যায্য অধিকার, ১১ মাসের বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে শ্রমিকদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। অবস্থানের ৫৫তম দিনে অবস্থানমঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রমিক নেতা কমরেড সমরকৃষ্ণ সিনহা।

কালা-কৃষি আইন

সাতের পাতার পর

এটা সামান্য টাকা। এই সামান্য পরিমাণ টাকা সরকার কৃষক তথা সামগ্রিক জনস্বার্থে খরচ করতে পারবে না কেন? সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু হলে দেশের ১৩০ কোটি মানুষ উপকৃত হবে, অথচ বাড়তি খরচ হবে বড়জোর বছরে দুই লক্ষ কোটি টাকা। সরকার এই সামান্য টাকা খরচ করতে চাইছে না।

অথচ, এই সরকারই মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে গত কয়েক বছরে ১৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দিয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো আছেই। এ থেকেই বোঝা যায় এই সরকার কাদের সরকার। তারা সমস্ত কৃষিপণ্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়ে কৃষক ও সাধারণ মানুষকে নিঃস্ব করে দিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যেই কৃষক-খেতমজুর সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি দেশের কৃষক-খেতমজুররা তাঁদের উপর ন্যস্ত এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব অবশ্যই পালন করবে।

তাঁরা আওয়াজ তুলছেন—'আমরা লড়ব, আমরা জিতব।' এসইউসিআই (সি) আগামী ২১ জানুয়ারি মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ফসলের ন্যায্য দাম সহ নানা দাবিতে কলকাতায় মহামিছিলের ডাক দিয়েছে। একের পর এক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে বাধ্য করতে হবে জনস্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com